কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১১ মে, ২০১৮ ০০:৫৯

শিক্ষা পদ্ধতিতেই বড় গলদ

রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাস করেছেন রবিন খান। চার বছর আগে এই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি জোর চেষ্টা করছিলেন একটি চাকরির। তিন বছর আগে একটি কম্পানিতে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি হয় তাঁর। কিন্তু এই চাকরি তিনি এক মাসের বেশি করতে পারেননি। এরপর আবার বেকার জীবন। পরিবারের বোঝা হয়ে বর্তমানে তাঁর দিন কাটে নানা লাঞ্ছনায়। উঠতে-বসতে তাঁকে শুনতে হয় পরিবারের সদস্যদের কটু কথা। অথচ তিনি দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী।

নানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, রবিনের এই পরিণতির জন্য তিনি নিজে দায়ী নন। দায়ী নন তাঁর মা-বাবাও। দায়ী দেশের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি। পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর চেয়ে উল্টো পথে ধাবিত হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। অন্য দেশগুলোতে যেখানে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, সেখানে আমাদের দেশের সবচেয়ে খারাপ ফল করা শিক্ষার্থীর জন্যও উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত। ফলে বাংলাদেশে গ্র্যাজুয়েট করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও চাকরির দেখা মিলছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সাধারণ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য বাংলাদেশের মতো এত দৌড়ঝাঁপ পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সার্টিফিকেটধারী বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এই শিক্ষিত বেকার তৈরি বন্ধে কারিগরি শিক্ষায় জোর দিতে হবে বেশি। কারিকুলাম নিয়মিত আপডেট করতে হবে। কারণ আমাদের শিক্ষা কারিকুলাম মান্ধাতা আমলের। ফলে যেসব শিক্ষা বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে, তা কর্মমুখী নয়।’

ব্রিটেনের শিক্ষা কারিকুলাম ঘেঁটে জানা যায়, ওই দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিই ঠিক করে দেয় একজন শিক্ষার্থীর গতিপথ কী হবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্য একই শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও নবম শ্রেণি থেকে মেধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ একই ক্লাসে পড়লেও দুই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য দুই ধরনের প্রশ্ন হয়। একটি গ্রুপ থাকে ‘উচ্চতর গ্রুপ’, যারা ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। আরেকটি গ্রুপ হচ্ছে ‘ফাউন্ডেশন গ্রুপ’ যাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নেই। ‘জিসিএসই বা ও লেভেল’ শেষ করার পর তাদের কারিগরি অথবা ভোকেশনাল শিক্ষায় যেতে হয়। ‘ফাউন্ডেশন গ্রুপ’-এর শিক্ষার্থীরা ‘এ-লেভেলে’ ভর্তি হতে পারবে না। অন্যদিকে ‘উচ্চতর গ্রুপ’-এর শিক্ষার্থীরা ‘এ-লেভেল’ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। আবার তারা ইচ্ছা করলে কারিগরি শিক্ষায়ও যেতে পারবে।

- কাগজে-কলমে বন্দি জাতীয় শিক্ষানীতি
- চাকরির বাজারের সঙ্গে সংগতি নেই কারিকুলামের
- বাড়ছে না মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ব্রিটেনের ইস্ট বুরি কমপ্রিহেনশিপ হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সায়েন্স টিচার দীন মোহাম্মদ মহসীন কালের কণ্ঠকে জানান, ‘ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থাই বলে দেয় ভবিষ্যতে কে কোন দিকে পড়বে। কেউ ইচ্ছা হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, এমন নয়। প্রতিটি শিক্ষাস্তরেই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয়ে যায়। শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই একজন শিক্ষার্থী দিকনির্দেশনা পায়। সেখানে অন্য কারো কিছু করার থাকে না। ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থাই শিক্ষার্থীদের মেধা ক্রমানুসারে তাদের স্ব-স্ব গন্তব্যে নিয়ে যায়।’

২০১০ সালে প্রণীত বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হবে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তর সম্পন্নের পর একজন শিক্ষার্থীর কারিগরি শিক্ষায় যাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। আবার এক থেকে চার বছর পর্যন্ত বৃত্তিমূলক কোর্সও থাকতে হবে। কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হতে হবে ১:১২। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং দক্ষতা অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু এখনো কাগজে-কলমে বন্দি এই শিক্ষানীতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘গড্ডালিকা প্রবাহের মতো সবাইকে বিএ, এমএ পাসের দরকার নেই। জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে বলা হয়েছে। এরপর নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীদের একটা অংশ যাবে ভোকেশনালে, অন্য অংশ যাবে সাধারণ শিক্ষায়। আর এসএসসির পর একটা অংশ যাবে টেকনিক্যাল শিক্ষায়, অন্য অংশ যাবে উচ্চশিক্ষায়। যারা উচ্চশিক্ষায় যাবে, তাদেরও বড় অংশ যাবে প্রফেশনাল এডুকেশনে। স্বল্প অংশ যাবে লিবারের এডুকেশনে। এই পদ্ধতিতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা চললে বেকারত্বের বোঝা বইতে হবে না। কিন্তু এখনো সেই শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন আমরা দেখছি না।’

জানা যায়, দেশে যেখানে মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ স্কুল-মাদরাসার সংখ্যা ৩২ হাজার, সেখানে এসএসসি ভোকেশনাল পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র দুই হাজার ৪০০টি। এসএসসি পরীক্ষায় প্রতিবছর অংশ নেয় প্রায় ১৬ লাখ শিক্ষার্থী। আর কারিগরি থেকে অংশ নেয় মাত্র সোয়া এক লাখ শিক্ষার্থী। গড়ে প্রতিটি উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ স্কুল-মাদরাসার সংখ্যা ৬৫ থেকে ৬৬টি। অথচ কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র চার থেকে পাঁচটি।

দেশে সাধারণ সরকারি-বেসরকারি কলেজের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এসব কলেজে প্রতিবছর ভর্তি হয় প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী। যার বেশির ভাগই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। অন্যদিকে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা মাত্র ৪৯টি। সেখানে ৪৭ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায়। আর ৪৬১টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থাকলেও ভালোমানের রয়েছে মাত্র ৩০টি। একইভাবে দেশে বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৯টি। এর বাইরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও বিভিন্ন কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে। একেবারে ন্যূনতম নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হতে পারে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অনেক শিক্ষার্থী কোনো চাকরি পায় না।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘সরকার কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সে অনুযায়ী টার্গেটও ঠিক করা হয়েছে। আগে আমাদের চিন্তা ছিল, প্রতিষ্ঠান আগে, তারপর কোয়ালিটি। কিন্তু এখন আমরা মান বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছি।’

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com